ISSN : 23205598

লোকস্বর

মার্চ ২০২৩, একাদশ বর্ষ, ২২তম সংখ্যা

Peer Reviewed Research Journal

লোকস্বর

Peer-Reviewed Research Journal
11th Year, Vol. 22, March 2023

সম্পাদক
ড. সুকান্ত মুখোপাধ্যায়

কার্য-নির্বাহী সম্পাদক
ড. মনোজ মণ্ডল

লোকস্বর
মরালী প্রকাশনী
ঝিলপাড় রোড, বাকসাড়া, হাওড়া-৭১১১১০

Lokoswar

A Peer-Reviewed Research Journal

ISSN : 2320-5598

Edited by Dr. Sukanta Mukhopadhay (Editor) & Dr. Manoj Mandal (Executive Editor),

11th Year, Vol. 22, 31th March 2023

Rs. 375/-

Mobile-9339590771

Mobile- 9830432239

Journal Office Address : Rammohan Apartment, 19, Rammohan Mukherjee Lane, Shibpur, Howrah-2

e-mail : lokoswarjounal@gmail.com

প্রকাশ

একাদশ বর্ষ, ২২তম সংখ্যা

৩১শে মার্চ, ২০২৩

বর্ণ প্রতিস্থাপন ও প্রকাশ

Marali Prakasani

Jhilpar Road, Baksara, Howrah-711110

Mobile- 9339590771

মূল্য : ৩৭৫ টাকা

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
পরবাসী : মানে ?	আশিস রায়	৯
'নাটুকে রামনারায়ণ' : একটি সম-আলোচনা	টুম্পা রায়	১৭
মানবতাবাদ ও নৈতিক উৎকর্ষের দিশারী : ঋষি অরবিন্দের পূর্ণ যোগ	কল্পিতা নন্দী	২৪
তিরিশ দশকের বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রদ্রোহীতার আস্ফালনেও রবীন্দ্রতন্ময়তা : প্রসঙ্গ প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা	পরেশ চন্দ্র মাহাত	৩২
ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতায় বনফুলের অনুগল্প	শ্রেয়সী দাস	৪২
রঙ্গমঞ্চ ও বাদ্যযন্ত্র	শ্রী রত্নাঙ্কুর মিত্র	৪৮
শহীদুল জহিরের জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং পরবর্তী বাস্তবতার জীবন্ত দলিল	সান্ত্বনা ঘরামী	৫৭
শান্তিপুরের পুজো পার্বণ ও মেলা	সুমিত ঘোষ	৭০
মরিচঝাঁপি পুনর্বাসন সমস্যা : ব্যর্থতা থেকে হিংস্রতা	সুদীপ্ত সেন	৭৯
নলিনী বেরার মাটির মৃদঙ্গ উপন্যাসে প্রান্তিক জীবন ভাবনা	সুনীতি সরকার	৮৬
অমর মিত্রের ছোটগল্প : মাটি ও মানুষের কথা	মাধুরী বিশ্বাস	৯৪
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে মৃত্যু ভাবনা	শুভাশিস দাস	১০১
বাংলা থিয়েটার : সংকট ও উত্তরণ	মনোজ ভোজ	১১৩
স্বস্তিমৃত্যু : একটি নৈতিক মূল্যায়ন	ফারহিন হোসেন	১১৯
স্বাধীনোত্তর বাঁকুড়া জেলায় নাটক এবং অভিনয়ের চালচিত্র (সময়কাল ১৯৪৮ থেকে ২০২২)	রিয়া নন্দী	১৩৩
লোকসংস্কৃতি ও গাজনের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা : ইতিহাসের দৃষ্টিতে	শিল্পী পাঁজা	১৪৪
সুবর্ণরেখিক এলাকায় বৈষ্ণব সম্প্রদায় : 'দাঁড়ুয়া-বষ্টম'	হরিপদ মহাপাত্র	১৫২
নদিয়ার ঐতিহ্যবাহী কৃষ্ণনগরের প্রাচীন বারদোলের মেলা : ইতিহাস ও প্রাসঙ্গিকতা	নারায়ণ নন্দী	১৫৭
জাতীয় নাট্যশালার প্রাক্‌কথন : প্রসঙ্গ বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চ	সদানন্দ বেরা	১৬৬
ভারতবর্ষে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই ও নারীর অবস্থান : একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ	প্রভাস মণ্ডল	১৭৬
লোকায়ত সংস্কৃতি ও গণসংগীত ভাবনা	সুভাষ মিস্ত্রী	১৮৭
উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্ক : প্রসঙ্গ বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী-অপরাজিত	মনোজ মণ্ডল	১৯৪
গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকে মুসলমান চরিত্র : কয়েকটি চয়িত নাটকের প্রেক্ষিতে আলোচনা	সেখ ইদ মহম্মদ	২০১
Interrogating Gender Narrative Through Fiction	Amal Sarkar	২০৭

পরবাসী : মানে ?

আশিস রায়
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বিভাজিত হয় দেশ। যে দুটি নতুন দেশের সৃষ্টি হল সেখানেই রয়ে গেল সাধারণ মানুষদের নিয়ে রাজনীতির খেলা। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অবসান ঘটেনি কোথাও। থেকে গেল ধর্মের গোঁড়ামি। সন্দেহ। মানুষ মানুষকে ভাইয়ের আসন থেকে শত্রুর আসনে উন্নিত করলো। দাড়ি আর টিক্কি দেখলে মনের মধ্যে জন্ম নেয় হাজারো প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের নিরসন করতে গিয়েই খুন হতে হয় অসহায়, নিঃসহায় হত দরিদ্র্য সাধারণ মানুষকে। খুনী মানুষেরও এক সময় ভুল ভাঙে। হাসান আজিজুল হক 'পরবাসী' গল্পে সেই কথায় বলতে চেয়েছেন।

মূলশব্দ : দাঙ্গা, দেশভাগ, নাগরিক, প্রকৃতি, নিম্নশ্রেণি, হতাশা ।

মূল আলোচনা : এমন সংকীর্ণ ভাবনা আছে বলেই তো কথার পিঠে কথা বসে। বাস্তব আর ভাবনার মধ্যে অমিল অনেক। শত চেষ্টাতেও গোঁয়াড়দের আপনি বুঝিয়ে উঠতে পারবেন না। দেশভাগ আর দাঙ্গা বহু মানুষকে মনুষ্যত্বহীন করে দিয়েছে। অনেক নতুন শব্দেরও জন্ম দিয়েছে। শব্দগুলোকে কোনভাবেই মুছে ফেলে দেওয়া যায় না। শুধু চেষ্টাটাই থাকে। শব্দের হাত-পা গজায়। নতুন নতুন মানে নিয়ে এসে আমাদের সামনে হাজির হয়। তাহলে এর থেকে মুক্তির কি কোন সম্ভাবনা নেই। উপায় একটাই আত্ম উপলবদ্ধি। এই উপায়ের পথ দেখিয়েছেন অনেকেই। দেশভাগ আর দাঙ্গা নিয়ে একাধিক সাহিত্যিক তাঁদের রচনার মধ্যে নিজস্ব ভাবনা চিন্তা ফুটিয়ে তুলেছেন। হাসান আজিজুল হক 'পরবাসী' গল্পে দেখাতে চাইলেন মানুষ তার নিজের দেশেই যেন পরবাসী।

মানুষের নিজের দেশ কোনটা? এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজা অনেকটাই কঠিন। সুদীপ্ত ভৌমিক 'নাগরিক?' নাটকে একই প্রশ্ন করেছিলেন মানুষ তার নাগরিকতার প্রমাণ কেমনভাবে দেবে। কতগুলি কাগজ দিয়েই তাকে প্রমাণ দিতে হবে সে কোন দেশের নাগরিক, কোন ধর্মে বিশ্বাসী। একজন মানুষের চাওয়া পাওয়ার কোন মর্যাদা নেই। সে কি চায়, কোন জায়গায় থাকতে চায় এসবের কোন দাম বা প্রশ্রয় কোনটাই রাষ্ট্র দেয় না। রাষ্ট্র বলতে ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা সুবিধাভোগী মানুষদের কথাই বলতে চাইছি। তাদের ভালোমন্দ, তাদের সুবিধার জন্য সাধারণ মানুষকেই তারা বলি চড়ায়। যেমনভাবে পুজোতে পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। কিন্তু পাঁঠার কোন মত নেওয়া হয় না।

দেশভাগকে কেন্দ্র করেই 'পরবাসী' গল্পটি রচিত হয়। গল্পটি আরম্ভ হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনার মধ্য দিয়ে। কান পেতে শোনার চেষ্টা করলে, বোঝা যাচ্ছে কিছু একটা শব্দ হচ্ছে। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছুই বোঝা গেল না। নিঃশব্দে শিশিরের হিমে পাতাগুলো ভিজে আছে। অল্প সময়ের মধ্যে মাটিও বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। শীতের শেষে যেনো সারাদিন ধরে উত্তরের দিক থেকে ঝড়ের বেগে বাতাস দিচ্ছে। বাতাসের শীতলতা শরীরের সমস্ত উত্তাপ শুষে নিচ্ছে। সন্ধ্যা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাস গাছের শুকনো পাতাগুলোকে ঝরিয়ে দিয়ে বিদায় নিতে চাইছে। চারিদিকের প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখে মনে হচ্ছে কয়েক হাত জায়গা বাদ দিয়ে নিউমোনিয়া রোগীর শ্লেষ্মার মতো জমে বসেছে কুয়াশা। এই কুয়াশা এবং ম্লান রঙের আকাশ ও বাসি মড়ার মতো জোলো অন্ধকারের নিচে তার চারপাশের পৃথিবীটা স্তব্ধ হয়ে আছে। ওয়াজদ্দি কান পেতে কিছু একটা শোনার চেষ্টা করলো। কিছু একটা শব্দ কিন্তু কিছুই শোনা গেল না। বাতাসের কিংবা ঝরাপাতার শব্দ, কিংবা শুকনো পাতার ওপর শিশির পড়ার টপটপ শব্দ অথবা কোনো ছোট প্রাণীর পায়ের শব্দ। কোন কিছুই ওয়াজদ্দি শুনতে পেল না। মোটা ছেঁড়া র্যাপারটা ভালো করে জড়িয়ে সে এবড়ো-খেবড়ো মাটির ওপর, খড়ের রঙের ভিজে দুর্বার অপর দুই কনুইয়ের ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে কুয়াশার দিকে চেয়ে রইল।

প্রকৃতির এই পরিবেশের মধ্য থেকে হাসান আজিজুল হক, নতুন শব্দের খোঁজ করছিলেন। ওয়াজদ্দি বক্ষস্পন্দন ছাড়া আর কোন শব্দ পেল না। নিঃশব্দের জগতে সে যেনো শব্দের খোঁজ করতে লাগলো। সারাদিক এবং সন্ধ্যের কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত্য অজস্র শব্দের বিরাম ছিল না। কিন্তু ওয়াজদ্দি কোন শব্দের কুলকিনারা করতে পারলো না। অনেক দূরের কালো পীচ ঢালা রাস্তা দিয়ে গোঁ গোঁ করে বাস ট্রাক যাচ্ছিল। মিষ্টি, দ্রুত স্বল্পস্থায়ী শব্দ করে ছোট গাড়িগুলির – এমনকী তীক্ষ্ণ আওয়াজ করে যে ট্রেন গেল তার শব্দও শুনতে পেয়েছে। সারাদিনই সে এরাকম অজস্র শব্দ শুনেছে। সব শব্দ তালগোল পাকিয়ে নিজের ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ পাতাল ভাবনায় মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে মাথার উপর দিয়ে একঝাঁক কাক উড়ে গিয়েছে, জোড়ায় জোড়ায় বক উড়ে গিয়েছে, এরপর শঙ্খচিল, সকলের শেষে একটি দুটি একাকী

পাখি তার মধ্যে একটা বিরাট পাখি বিশাল পাখা অনেকক্ষণ পরে পরে নাড়াতে নাড়াতে, পা দুটো পিছনের দিকে করে মাটির সঙ্গে সমান্তরাল করে সুন্দর মাথাটি এদিক ওদিক করে ঘুরিয়ে চলে গেছে। নিজের মনে আওয়াজ করতে করতে পাখিটি নিজের মনে চলে যেতে থাকে। মাঠের একপ্রান্তে গ্রামটার বাঁশঝাড়ে ছোট বড় অসংখ্য পাখি একসঙ্গে কলরব শুরু করেছে। রাত একটু বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা কোথায় চলে গেল আর খুঁজে পাওয়া গেল না। এই পাখীদের তো 'পরবাসী' বলা হয় না। তাহলে মানুষের জন্য কেনো এই শব্দের প্রয়োগ করা হয়। হাজার প্রশ্ন ঘোরে তার মনের মধ্যে।

ওয়াজদ্দি শীতে কাঁপতে লাগলো। র‍্যাপারটা ভালো করে মুড়ি দিয়ে, পেটের কাছে র‍্যাপারের বিরাট ফুটোটা লুঙ্গি দিয়ে ঢাকতে গিয়ে নিজেকে প্রায় বিবস্ত্র করে ফেলেছে এবং এই অবস্থার মধ্য দিয়ে নিজেকে ক্ষুধার্ত অনুভব করলো। ময়লা ছোট কাপড়ে বাঁধা মোটা চিড়ে বার করে অন্যমনস্কের মতো চিবাতে থাকলো। ফসলকাটা মৃত মাঠের কঠিন শীতের মধ্যে উবু হয়ে বসে থাকা ভোঁতা মানুষটা যেন চিৎকার শুনতে পেল, –

'বচির, বচির র‍্যা, এ বচির, ঘুম মারচিস শুয়ে শুয়ে, মুনিব যি কান কাটবে ব্যা। আচ্ছা ঘুম র‍্যা তোর। চিৎকারটা যেন সে একবারই শুনল তার মাথার ভিতরে। তারপর আবার স্তব্ধ সব।'[১১]

এই কঠিন শীতে মাঠের মধ্যে কাজ আরম্ভ হয়েছে। সাধারণ মানুষের শীতের মধ্যেই কাজ করতে হয় নিজের জীবন ধারণ করার জন্য। শীত যত প্রচণ্ডই হোক না কেনো, যতই নিরাশাব্যঞ্জক হোক ফসলের পরিমাণ যতই কম হোক শীতের ফসল মালিকের বাড়িতে তুলে দিতেই হবে। শীত কিছুই করতে পারবে না। ফলে গোটা গ্রামের কাস্তে সচল হয়ে ওঠে এই শীতের মধ্যে। মোটা ছেড়া র‍্যাপার অথবা দুর্গন্ধ কাঁথা গায়ে দিয়েই সাধারণ মানুষদের শীত এবং উত্তুরে বাতাসের সম্মুখীন হতে হয়েছে। পৌষের মাঝামাঝি আসার সঙ্গে সঙ্গে রুপোর মতো সাদা হয়ে এল সামান্য মাত্র ইস্পাত ছোঁয়ানো লোহার কাস্তে। মাঠের ধান কাটা হওয়ার পর আটিঁবাধা শেষ হলে দেখতে লাগে ঠিক যেনো যুদ্ধক্ষেত্রে অগণিত মৃত সৈনিকের মতো মোটা মাথার আঁটিগুলি জমিতে পড়ে রইল কিছুদিন। শিশির দিয়ে ধুয়ে ধানের শিষগুলি চকচকে সোনার বর্ণ আকার নিয়েছে। কাস্তের কাজ মোটামুটি শেষ হয়েছে। সমগ্র শীতকালটা এবং শীত আক্রান্ত দেশের ছবি এই অশিক্ষিত বর্বর মনে ছায়া ফেলেছে। শীতের সমগ্র সময়টা সে হয়তো পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করতে পারবে না কিন্তু তার মনের সজীবতায় গাঢ় হয়ে আছে। মনে মনে সমগ্র কাহিনি সে অনুভব করে, ছবি আর শব্দ যেন তার কাছে সত্য ও সমগ্র হয়ে ওঠে। ছবিটা তার মনের কাছে ভেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, শীতের বীভৎস স্তব্ধ নির্জন রাত্রির আকাশের নিচে অসাড় হয়ে যেতে যেতে, ক্ষুধায় চেতনা হারাতে বসেও সে দু'কনুয়ের অপর ভর দিয়ে আকুল হয়ে পিছনের দিকে ঘাড় ফেরাল। কুয়াশা জমাট হয়ে তার চোখের ওপরে পর্দা ফেলে দিল। সে কোন কথাই বলতে পারলো না, পাথরের মতো নিস্তব্ধ

হয়ে রইল। যে-খাল্টায় সে আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে তাকে উষ্ণতা দেবার পরিবর্তে শীত বড়ো বড়ো দাঁত বার করে কামড়াতে লাগলো। সে গোল করে পুঁটুলির মতে হয়ে বসে থাকে আর নিজের মনের মতো করে ছবি আঁকতে থাকে এবং সে যেন শুনতে পায় বসিরকে ডাকার শব্দ। বচির ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি না উঠলে মনিব কান কেটে দেবে সুতরাং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদেরকে কাজ শেষ করতে হবে। বসির বউয়ের শরীরের ওম থেকে নিজেকে এক ঝটকায় নিজেকে সরিয়ে নিয়ে উঠে পড়তো। গায়ে র‍্যাপারটা জড়িয়ে নিয়ে আসতে আসতে সে বাইরে বেরিয়ে আসতো। বাইরে বেরিয়েই সে চাচা ওয়াজদ্দিকে দেখতে পেতো। ওয়াজদ্দির কণ্ঠ অপ্রসন্ন থাকে, দেরি হয়ে গিয়েছে আবার, কেননা এবারের মালিক বিশে কত্তা লোকটা ভালো নয়। কত্তার সাঁওতাল মনিব অত্যন্ত অভদ্র। তারা সারারাত ধরে মদ খায় এবং তিন প্রহর রাত থেকে খেতে গিয়ে হাজির হয়। পাহারাদারকে নিয়ে হয়েছে বিপদ এদের জন্য এই শীতের রাতে মাঠে গিয়ে হাজির হতে হবে। ওয়াজদ্দি তাড়াতাড়ি করলেও বসিরের তেমন কোন তাড়া নেই। সে তামাক খেয়ে তবেই মাঠের উদ্দেশ্যে রহনা দেবে। ওয়াজদ্দি বিশে কত্তাকে ভয় করলেও, কাজ হারানোর ভয় পেলেও, বসির কিন্তু পায় না। সে সাফ জানিয়ে দেয় পোষমাসে কোন কাজের অভাব নেই। কাজের জন্য সবার মানুষের প্রয়োজন সুতরাং বিশে কত্তা তাড়িয়ে দিলেও তাদের কাজের কোন অসুবিধা হবে না। বারবার তামাক খাওয়ার কথা শুনে ওয়াজদ্দির তামাক খাওয়ার নেশা চেপে ধরে। দাওয়ার এক কোনে বসে সে জানিয়ে দেয় ছাড়বি নে যখন, তখন দুটান দিয়েই তবে যাই। ওয়াজদ্দি মিনিট পাঁচেক নিবিষ্ট মনে টান দিয়ে ধোঁয়ার মধ্যে প্রায় গোপন থেকে বলে তামাক না খেয়ে কাজে যাওয়াটা মোটেই কাজের নয়। ওয়াজদ্দি আর বসির নিজেদের মধ্যে ধান কাটা নিয়ে কথা বলে। বসির তার ক্ষেতের ধান এখনি কাটতে চায় না, আগে সে কিছুদিন অন্যের জমিতে কাজ করে দুটো পয়সা ঘরে আনতে চায়। ওয়াজদ্দিরও একই অবস্থা।

ওয়াজদ্দিকে একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। বসির চাচাকে জিজ্ঞাসা করে আবার হিড়িক লাগবে তুমি কিছু শুনেছ। চাচা তেমন কিছু শোনে নি। বসির জানায় চারিদিকে আজ শুধু ফিসির ফিসির, গুজুর গুজুর চলেছে। সকলে বলাবলি করছে –

'পাকিস্তানে হিঁদুদের লিকিন, একছার কাটচে- কলকাতায় তেমনই কাটচে মোচলমানদের।

ক্যা বললে ক্যা তোকে ? ওয়াজদ্দি খেঁকিয়ে ওঠে।

লোকে বলাবলি করচে যি !

তা করুক গো, তুই আপনার বাড়ি যা দিকিন- ভাত মেরে শুয়ে থাকগা।'[২]

চাচা এসব কথা কানেই নিতে চায় না। তিনি জানেন এবং বিশ্বাস করেন মানুষ তার আপনার দেশে থাকবে প্রাণভরা আশা আর ভরসা নিয়ে। জাতিগত বিদ্বেষ নিয়ে নয়। বসির ভয় পায়। সে শুনেছে আজ রাতে তাদের গ্রামেও মানুষ খুন করা হবে। চাচা এ

কথা শোনার পরেই বসিরকে মূর্খ বলে সম্বোধন করে। চাচা জানতে চায় কোন শালারা আসবে। বসির বলে লাবাবপুর, ছিষ্টিধরপুর থেকে মা কালীর পুজো দিয়ে হিঁদুরা আসবে। এটা শোনার পর ওয়াজদ্দির বড়ো বিরক্ত লাগে। মুখ দিয়ে আর কথা বেরোতে চায় না। সে বসিরকে জানায় বাড়ি চলে যা। যারা বলা বলি করছে তাদের কাস্তে দিয়ে গলা কেটে দিতে পারিসনি। একটু ধমকের সুরেই ওয়াজদ্দি জানায় বসির এবার একটু চুপ কর, বড্ডো ঠাণ্ডা লাগছে। দুজনেই ক্ষণিকের জন্য চুপ করে যায়। কিন্তু বসিরের মনের সন্দেহ যেতে চায় না। সে আবার বলে চাচা মনে হয় আবার খুনোখুনি আরম্ভ হবে। ওয়াজদ্দি আরো রেগে যায়, এবার সে বলে তোকে তখন থেকে বলছি চুপ করতে কিন্তু ব্যাদর ব্যাদর করে যাচ্ছিস। বসির কিন্তু কান দিল না চাচার কটুক্তিতে। কতকটা যেনো নিজের মতোই সে বলে গেল হাজার হলেও পাকিস্থানটা মোচলমানদেরর দ্যাশ, সেখানে মোচলমানদের রাজত্বি। চাচা জানায় তাহলে চলে যেতে পারতিস। বসির জানায় –

'আমাদের কী সায়োস হয় চাচা ঘরসংসার লইয়ে কোতাও যেতে। তবু দ্যাশটো –

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল ওয়াজদ্দি – বশিরের মুখের ওপর তীব্র চাহনী ফেলে নিঃশব্দে ওকে যেন দগ্ধ করতে থাকে সে। বশির দাঁড়িয়ে পড়ে বোকার মতো। তেমনই করেই চেয়ে থাকতে থাকতে ওয়াজদ্দি জিজ্ঞেস করে, তোর বাপ কড়ো ? এঁয়া – কটো বাপ ? একটো তো ? দ্যাশ তেমনই একটো। বুইলি ? যা – বলেই ওয়াজদ্দি নিজেই চলে গেল হনহন করে।'[৩]

তবে বসিরের আশঙ্কাই ঠিক হল শেষ পর্যন্ত ওরা এল। দূর দূর গ্রাম থেকে ছোট ছোট মাটির ঘরের উষ্ণতা ত্যাগ করে কপালে চওড়া করে সিঁদুর লেপে অপিরিচিত মানুষদের হত্যা করতে এল। ওদের আসার আগে প্রায় তিন ঘণ্টা তারা মেঝেতে পাতা ঠাণ্ডা বিছানায় বসে ঢাক কাঁসর এবং শাঁখের শব্দ শুনলো। নিস্তব্ধ মাঠ এবং শীতের কুয়াশা ছিঁড়ে ভেসে এলো ঢাকের আওয়াজ। মাঘের আকাশ শিউরে উঠল কাঁসরের ঢং ঢং আওয়াজে এবং রাত্রি বিরাট একটা ঈগলের মতো কুৎসিত নখ দিয়ে নিরীহ পায়রার মতো গ্রামটাকে চেপে ধরলো। গ্রামের মানুষের সামান্য প্রতিরোধের ব্যবস্থা এক নিমিষেই ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেল। রাস্তার উপরে আড়াআড়ি করে রাখা গরুর গাড়িগুলি প্রথমেই ভেঙ্গে ফেলা হল। বসিরের চোখের সামনেই প্রথম বলি হল চাচা ওয়াজদ্দি। তারপর খড়ের ছাওয়া মাটির ঘরগুলিতে আগুনের শিখা উঠলো আর সেই আলোতে খুনিদের মুখগুলি জ্বলজ্বল করে উঠল। আগুনের শিখাতেই দেখা গেল খুনিদের কপালের সিঁদুর এবং তীব্রভাবে ঝলকে উঠল ওয়াজদ্দির তাজা রক্ত এবং মৃত ও ভীষণভাবে বিস্মিত তার মুখের ওপর আগুন খেলা করতে আরম্ভ করলো। রক্ত নিয়ে হোলি খেলা করার দলটা এবার বসিরের বাড়িরে দিকে রহনা দিল। দল ছেড়ে প্রাণপণ ছুট দিল বসির। বসির দেখতে পেল বাড়িটা পুড়ে শেষ হয়ে গিয়েছে। বাড়িটা স্থির, মুক হয়ে আছে। বল্লম দিয়ে মাটির সঙ্গে গাঁথা বশিরের আট বছরের ছেলেটা। বাড়িটার মতোই শান্ত হয়ে

আছে ছাব্বিশ বছরের একটি নারীদেহ – কালো একখণ্ড পোড়া কাঠের মতো পড়ে আছে ভাঙা দগ্ধ ঘরে। কাঁচা মাংস পোড়ার উৎকট গন্ধ আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে আছে। বসির চিৎকার করে বলে ওঠে –

'আল্লা তু যি থাকিস মানুষের দ্যাহোটার মধ্যি – বুকফাটা চিৎকার করে উঠল বশির, কোতা, কোতা থাকিস তু, কুনখানে থাকিস বল্।' ৪ সব হারিয়ে বসির এখন একা। সে কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করছে কিন্তু কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। মৃত্যু মিছিল তাকে ঘিরে ধরে রেখেছে। সে জন্য কোন ভাবেই নিজের প্রিয় জনদের মৃত্য কোন মতেই ভুলতে পারছে না। সুকান্তের মতো তারও মনে হচ্ছে, –

'প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,
ভেঙেছিস ঘরবাড়ি,
সে কথা কি আমি জীবনে মরণে
কখনো ভুলতে পারি ?
আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজনহারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই।'[৫]

হঠাৎ একটা উৎকট শব্দে সে যেনো সম্বিৎ ফিরে পেল কাঠবিড়ালের মতো উঠে এল বশির, এসে দাঁড়াল বাঁক কাঁধে নির্বাক মানুষটার সামনে। সম্পূর্ণ অপিরিচিত দুজন মানুষ চাঁদের আলোয়, খাল্টার উঁচু পাড়ের কিনারায় এসে দাঁড়াল। বসির দেখলো সে মানুষটার পরনে মোটা ধুতি, গায়ে চাদর, কাঁধে বাঁক। তার কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। তার মুখে ঝলকে পড়লো বল্লমগাঁথা সন্তানের উষ্ণ রক্ত। মৃত মাছের চোখের মতো ওয়াজদ্দির শাদা চোখ অর্থহীনভাবে যেনো বছিরের দিকে চেয়ে আছে। তীব্র চোখে ওর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কুড়ুলটা তুলে নিয়ে মানুষটার মাথায় প্রচণ্ড একটা আঘাত করল বসির। বাজ পড়ার মতো কড় কড় আওয়াজ হলো এবং বাঁকশুদ্ধ সেই মানুশটা বিস্মিত হতচকিত একটা মৃত্যু চিৎকার করে খাল্টার ভিতরে গড়িয়ে পড়লো। সুকান্ত যেমন ভেবেছিল, বসিরও যেনো তেমন ভাবছে, –

'সীমান্তে আজ আমি প্রহরী।
অনেক রক্তাক্ত পথ অতিক্রম ক'রে
আজ এখানে এসে থমকে দাঁড়িয়েছি –
স্বদেশের সীমানায়।'[৬]

অসহায় মানুষদের বাঁচার কোন উপায় থাকে না। চারিদিকে গোঁড়াদের নিয়ে বড়ো মুশকিল। নিরীহ মানুষরা জাতিগত বিদ্বেষ আর দাঙ্গার শিকার। দেশভাগের পরেও মানুষের মন থেকে সম্প্রদায়িক রাজনীতি বার হতে পারেনি। জাতি বিদ্বেষ এতটাই বড়ো হয়ে দেখা দেয় সেখানে কেউ আর মানুষকে মানুষ বলে জ্ঞান করে না। এ উদাহরণ

সন্তোষ কুমার ঘোষের দ্বিজ গল্পতেও দেখতে পাই, -

'সারি সারি মাথাকামানো উড়ে বামুন বসে আছে, ফুল, বেলপাতা, চন্দন আর তিলক কাটার জন্যে সোডার তোতলের ছিপি নিয়ে। ত্রিসীমানাতেও ঘেঁষতে দেয় না কাউকে। দুর্বোধ্য ভাষায় গালাগাল করে। নিশিকান্ত বসতেই পেল না।'[৭]

ওয়াজদ্দি গুটি মেরে শুয়ে থাকে তার মনে হচ্ছে সে যেনো স্বপ্ন দেখছে। মানুষ কেমন করে মারা তা সে জানে না। কিন্তু তার মনে হতে লাগলো মরার ঠিক আগে মানুষ তার সমস্ত জীবনের ছবি একবারে দেখতে পায়। তার আরো বিশ্বাস ছিল মরার সময় কেউ কিছু ভাবতে পারে না, সুখ দুঃখ অনুভব করতে পারে না, শুধুদেখা ছাড়া আর কোন কাজ থাকে না। সে আর কিছু ভাবতে পারছে না। এই শীতে শরীরটার মতো মনটাও অবশ হয়ে জমে গিয়েছিল, সে তো সুখ দুঃখের আতীত হয়ে গিয়েছিল, আর তার কোন কষ্ট অনুভব করার মতো অবস্থায় নেই। এখন আর শীত থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টাও করছিল না। শুধু চোখ বন্ধ করে এক দৃষ্টে মনের দিকে চেয়ে নিরীহ অশায়ভাবে সে এক্টির পরে একটি দেখতে পাচ্ছিল।

'আমার শরীরের বিভিন্ন অংশে জোড়া-তালি দেওয়া
আনাড়ি ব্যান্ডেজ ফ্যাল ফ্যাল তাকিয়ে দেখছে চারপাশের
রুক্ষ গাছগুলোকে। কী একটা করুণ সুর
ভেসে আসে কে জানে কোত্থেকে। আমার শরীর থেকে টুকরো
টুকরো কী খসে পড়ছে স্ট্রেচারে ? মাটিতে ? এ আমি
কোথায় চলেছি ? স্ট্রেচারে-চালকদের প্রশ্ন করতে গিয়ে
ব্যর্থ হচ্ছি বার বার। তবে কি আমার গলা থেকে কান
আওয়াজ বেরুচ্ছে না ? নাকি ওরা কানে তুলো গুঁজে
রেখেছে ঢের আগে থেকে ! এক রত্তি শক্তি নেই শরীরে, অথচ
লাফ দিয়ে মাটিতে দাঁড়াতে ভারি ইচ্ছে করছে।'[৮]

ভগবানের এই দেশে মানুষকে কেনো অসহায় ভাবে থাকতে। যার যেখানে ইচ্ছা সে সেখানেই থাকবে। কতগুলি শব্দের বেড়াজালে মানুষের স্বাধীনতায় বার বার আঘাত হানার প্রয়োজনীয়তা কী ? 'এই পৃথিবীতে মানুষে মানুষে কোন বিভেদ থাকবে না। থাকবে না কোন ধর্মের বেড়াজাল। মানুষ যে দেশে খুশি যেতে পারবে অনায়াসে। স্বপ্নের এই পৃথিবীতে বর্ডার বলে কিছু থাকবে না। রিফিউজি শব্দটি মুছে যাবে ডিকশনারি থেকে। নিজের জায়গা থেকে কাউকে পালিয়ে গিয়ে অন্যত্র ঠাই নিতে হবে না। নাগরিকত্বর ভিক্ষা করার দিন শেষ হোক। আমারা প্রত্যেকেই এই পৃথিবীর নাগরিক।'[৯] পরবাসী শব্দটি তখন অযৌক্তিক হয়ে যাবে সব জায়গা থেকে।

বসির ভেবেছে সম্ভবত পাকিস্থানের দাঙ্গায় তার মতোই স্ত্রী সন্তান হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে ব্যক্তিটি ভারতে পালাতে চাইছে। বসিরের মধ্যেকার জিঘাংসা বেরিয়ে এল। নিজের

পোড়া স্ত্রী, বল্লম গাঁথা পুত্র, মৃত ওয়াজদ্দির চাহনি তাকে শান্ত থাকতে দেয় নি। তার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়েছে। সে অপরিচিত মানুষটিকে হত্যা করার পরে বুঝতে পেরেছে অনেক বড়ো ভুল করে ফেলেছে। মৃত মানুষটির মুখে ওয়াজদ্দির মুখচ্ছবি ভেসে উঠেছে। যে রক্তপাত সে ছেড়ে এসেছে আর যে রক্তপাত সে নিজে ঘটিয়েছে এই দুইয়ের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। বসিরের চোখে জল নেমে আসে। সে আবার দাঙ্গা পূর্ব নিরীহ বসিরে পরিণত হয়।

তথ্যসূত্র

১। হাসান আজিজুল হক, শ্রেষ্ঠ গল্প, অনুষ্টুপ, পৃষ্ঠা – ৬০
২। তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৭
৩। তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৮
৪। তদেব, পৃষ্ঠা- ৬৯
৫। সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুকান্ত রচনাবলী, সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা- ৬০
৬। প্রাগুক্ত, সূত্র – ৫, পৃষ্ঠা- ৯৪
৭। সন্তোষ কুমার ঘোষ, একুশ এবং সাবালক, সোজাসুজি, দে'জ, পৃষ্ঠা- ২৮৫
৮। কঙ্কর সিংহ, দেশভাগ সংখ্যালঘু সঙ্কট বাংলাদেশ, আমরা : এক সচেতন প্রয়াস, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৬৭, পৃষ্ঠা- ২৫৬
৯। আশিস রায়, নাগরিক ? – প্রমাণ করার উপায়, অতঃপর, মুর্শিদাবাদ, পৃষ্ঠা- ২১